بسم الله الرحمن الرحيم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ১৩ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ করছিলাম আর এই স্মৃতিচারণে তাবুকের যুদ্ধেরও উল্লেখ হয়েছে। হযরত হেলাল (রা.) পশ্চাতে থেকে যাওয়া সেই তিনজনের একজন ছিলেন যারা এই যুদ্ধে যোগদান করেন নি। মহানবী (সা.) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর কিছুটা শাস্তিও প্রদান করেন, এতে এই তিনজন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হয়ে ইস্তেগফার ও তওবা করতে থাকেন, এমনকি এই তিনজন সাহাবীর আহাজারি, যাদের মধ্যে হযরত হেলাল (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গৃহীত হয় আর তাদের ক্ষমার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আয়াত অবতীর্ণ করেন। যাহোক, এ সম্পর্কে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, সাহাবীরা এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কত বেশি কুরবানী করেছিলেন আর এটিও উল্লেখ হয়েছিল যে, আরো কতিপয় মানুষ, যাদের হৃদয়ে কপটতা ছিল, (তারা) এতে যোগদান করে নি আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কয়েকজন প্রথমে (যুদ্ধে) যেতে অস্বীকার করে আর তিনি (সা.) এমন কপটদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরো কিছু কথা রয়েছে যা আমি এখন উপস্থাপন করবো।

সেসব মানুষ যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে না যাওয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল জাদ্দ বিন কায়েস। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সাথে যাবে না? সে এই অজুহাত দেখায় যে, সে মহিলাদের কারণে পরীক্ষা বা নৈরাজ্যের মধ্যে পড়তে পারে, তাই তাকে পরীক্ষায় ফেলা না হোক, অতএব মহানবী (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে দেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতও অবতীর্ণ করেন যে,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (সূরা তওবা: ৪৯)

অর্থাৎ, আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে অনুমতি দাও আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। জেনে রাখ, তারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদেরকে সবদিকে থেকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

মদিনার একজন ইহুদির নাম ছিল সুয়ায়লাম, সে মদিনার জাসূম অঞ্চলে বসবাস করতো, যাকে বি'রে জাসেমও বলা হয়। এখানে মদিনা হতে সিরিয়ার পথে আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান এর কূপ ছিল। এর পানি খুবই সুমিষ্ট ছিল। মহানবী (সা.)-ও এর পানি পান করেন এবং (তা) পছন্দ করেন। সেই ইহুদির বাড়িটি ছিল কপটদের আঁখড়া। মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, মুনাফিক বা কপটরা সেখানে সমবেত হচ্ছে আর তারা লোকজনকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে যেতে বাধা দিচ্ছে। মহানবী (সা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে বলেন, তাদের কাছে যাও আর তাদের কাছে

গিয়ে সেসব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা তারা বলেছে। যদি তারা একথা অস্বীকার করে তাহলে তাদের বলে দিও, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা এই এই (কথা) বলেছ। হযরত আম্মার (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন এবং সেসব কথা বলেন তখন তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করে। তাদের এই অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লা এই বাক্যে বর্ণনা করেছেন যে,

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (সূরা তওবা: ৬৪-৬৬)

অর্থাৎ: মুনাফিকরা ভয় পায়, তাদের বিরুদ্ধে (আবার) কোন সূরা না অবতীর্ণ করে দেয়া হয়, যা এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের মনের গোপন কথা জানিয়ে দিবে। তুমি বল, 'তোমরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাক। (অর্থাৎ, এরা ভয় পাবার কথাও হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেই করে থাকে) তোমরা যে বিষয়ের ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিবেন।' তুমি তাদের জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা যে কেবল খোশগল্প ও ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত ছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা কোন (খোঁড়া) অজুহাত দেখিও না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। আমরা যদি তোমাদের এক দলকে মার্জনা করে দেই তাহলে অন্য একটি দলকে শাস্তিও দিতে পারি, কারণ তারা অবশ্যই অপরাধী।

যাহোক, এই ছিল তখনকার অবস্থা, (যুদ্ধে) যাবার পূর্বেই না যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল। মুনাফিকরাও তাতে জড়িত ছিল আর ইহুদিরা তাদেরকে প্ররোচিত করছিল। কতক খোঁড়া অজুহাত দেখাতে থাকে আর পরবর্তীতে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-এর সমীপেও অজুহাত দেখায়। যাহোক, তিনি (সা.) তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করেন। মহানবী (সা.) যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন আর মদিনার নিকটে বা উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন তিনি (সা.) বলেন, মদিনায় কতক লোক এমন আছে যারা প্রত্যেক সফর ও উপত্যকায় তোমাদের সাথে ছিল। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা যদি মদিনায়ই থাকে– তাহলে কীভাবে (আমাদের) সাথে হলো? তিনি বলেন, ঠিকই বলেছ, তারা মদিনায়ই আছে কিন্তু কোন অজুহাত বা ব্যাধি তাদের আটকে রেখেছিল। এরা এমন মানুষ ছিল যাদের অজুহাতও সঙ্গত ছিল এবং তাদের ব্যাধি ছিল বা কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে কারণে তারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারেন নি, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তোমাদের সাথেই রেখেছেন। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সফরে একবার মহানবী (সা.) বলেন, আমি দ্রুত যাচ্ছি, কাজেই তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা আমার সাথে দ্রুত আসুক আর যার ইচ্ছা থেকে যাক অর্থাৎ ধীরেসুস্থে পেছনে পেছনে আসুক। এরপর বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা যাত্রা করি– এমনকি আমরা মদিনা দেখতে পাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এটি 'তা'বা' অর্থাৎ পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর (জায়গা) আর এটি উহুদ, এটি এমন পাহাড় যা আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, আনসারদের বাড়ি-ঘরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বাড়ি হচ্ছে, বনু নাজ্জারের বাড়ি, এরপর বনু আব্দুল আশআল এর বাড়ি, এরপর বনু আব্দুল হারেস বিন খাযরাজ এর বাড়ি, এরপর বনু সায়েদার বাড়ি, এমনকি তিনি আনসারদের সব বাড়ি-ঘরকে উত্তম আখ্যায়িত করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আমাদের সাথে এসে মিলিত হন (বর্ণনাকারী বলেন) তখন আবু

উসায়েদ (রা.) বলেন, তুমি কি জানো, মহানবী (সা.) আনসারদের বাড়ি-ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন আর আমাদেরকে শেষভাগে রেখেছেন। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আনসারদের বাড়ি-ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন অথচ আমাদেরকে শেষভাগে রেখেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত? এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত বা হাদীস।

(তাবুক থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনাবাসী, নারী-পুরুষ এবং শিশুরা মদিনার বাইরে বা উপকণ্ঠে সানীয়্যাতুল বিদা'র কাছে আসে, অর্থাৎ সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সানীয়্যাতুল বিদা' মদিনার নিকবর্তী একটি স্থান আর মদিনা থেকে মক্কায় গমনকারীদের এই স্থানে গিয়ে বিদায় জানানো হতো, এজন্য এই স্থানকে সানীয়্যাতুল বিদা' বলা হয়। জীবনচরিত রচয়িতাদের দৃষ্টিতে যখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে, কুবার দিক থেকে মদিনায় প্রবেশ করেন, মদিনার এই দিকেও সানীয়্যাতুল বিদা' ছিল। হযরত আয়েশা (রা.)'র রেওয়ায়েত অনুসারে সেখানে মদিনার শিশুরা মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায় আর মেয়েরা এই গীত গাইছিল,

**তালআল বদরু আলাইনা মিন সানীয়্যাতিল বিদা'**
**ওয়াজাবাশ্ শুকরো আলাইনা মা দাআ' আলাল্লাহি দাআ'**

অর্থাৎ, সানীয়্যাতুল বিদা'র দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের ওপর উদিত হয়েছে, আর আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আবশ্যক হয়ে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কোন না কোন আহ্বানকারী থাকবে।

কয়েকজন হাদীসের ভাষ্যকার, যেমন বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, বুখারীর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। তার ধারণা হলো, খুব সম্ভব হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে যেসব পঙক্তির উল্লেখ রয়েছে, যা আমি পাঠ করেছি, এর সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ের সাথে হবে, কেননা তখন সানীয়্যাতুল বিদা'য় লোকেরা এবং শিশু-কিশোররা মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানিয়েছিল, কারণ সিরিয়া থেকে আগতদের এই স্থানেই স্বাগত জানানো হতো। মদিনাবাসীরা যখন মহানবী (সা.)-এর তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পায় তখন তারা আনন্দে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনার উপকণ্ঠে সেই স্থানে গমন করে, যেমনটি হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার স্মরণ আছে, আমিও অন্যান্য শিশু-কিশোরদের সাথে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য সে সময় সানীয়্যাতুল বিদা'য় গিয়েছিলাম, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ইমাম বায়হাকীও একথা বর্ণনা করেছেন যে, শিশু-কিশোররা মহানবী (সা.)-কে এসব পঙক্তি পাঠের মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিল যখন মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে এসেছিলেন। মোটকথা, ঐতিহাসিক এবং জীবনী লেখকদের উভয় প্রকার মতামত রয়েছে, অর্থাৎ কতকের মতে এটি মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের সময়কার এবং কতকের দৃষ্টিতে তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এসব পঙক্তি পাঠ করা হয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি ছিল, তিনি যখনই কোন সফর থেকে মদিনায় ফিরে আসতেন তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। অতএব তিনি যখন তাবুক থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি চাশতের (নামাযের) সময় মদিনায় প্রবেশ করেন

এবং প্রথমে মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়েন। নামাযান্তে লোকদের জন্য তিনি (সা.) মসজিদেই অবস্থান করেন (অর্থাৎ, দু'রাকাত নফল পড়ার পর সেখানেই উপবেশন করেন), তখন সেসব লোকও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিল আর কোন কারণ ছাড়াই পেছনে থেকে গিয়েছিল। তারা জেনেশুনে তাঁর (সা.) সামনে নিজেদের কোন না কোন অজুহাত উপস্থাপন করছিল, এমন লোকদের সংখ্যা ছিল আশির কাছাকাছি। সত্য কি তা জানা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাদের বিভিন্ন অজুহাত, (তিনি জানতেন যে, এরা যেসব অজুহাত দেখাচ্ছে তা মিথ্যা অজুহাত তা সত্ত্বেও) তাদের মনগড়া বিবরণ গ্রহণ করেন আর তাদেরকে উপক্ষো করেন এবং তাদের বয়আতও নেন এবং তাদের জন্য ইস্তেগফারও করতে থাকেন। কিন্তু যেমনটি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.) হযরত মুরারাহ্ বিন রবী' (রা.) এবং হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) কোন মিথ্যা অজুহাত দেখান নি আর একারণে কিছুকাল তারা মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টিও সহ্য করেন, অনেক কান্নাকাটি করেন, আহাজারি করেন আর অনুশোচনার সাথে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাদের তওবা গ্রহণ করার ঘোষণাও প্রদান করেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুরারা বিন রবী' আমরী (রা.)। হযরত মুরারা (রা.)'র পিতার নাম ছিল রবী' বিন আদী। তার পিতার নাম রবী' এবং রবীআ-ও বর্ণনা করা হয়। হযরত মুরারা বিন রবী' আমরী-র সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের বনু আমর বিন অওফ-এর সাথে। আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে তার সম্পর্ক বনু আমর বিন অওফ-এর মিত্র গোত্র কুযাআর সাথে ছিল। কুযাআ আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র, যাদের অবস্থান মদিনা থেকে দশ মাইল দূরের কুরা উপত্যকার সামনে মাদায়েনে সালেহ্-র পশ্চিমে। হযরত মুরারা (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইমাম বুখারী ও সাহাবীদের জীবনচরিত সম্পর্কে রচিত পুস্তকাদিতে বদরের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ইবনে হিশাম বদরী সাহাবীদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করেন নি। তিনি সেই তিনজন আনসার সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন-

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ সেই তিনজনের তওবা গ্রহণ করে সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, এমনকি ভূপৃষ্ঠ এর বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। আর তারা বুঝে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তাঁর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই বার বার তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়াময়। **(সূরা আত্ তওবা: ১১৮)**

যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চাতে থেকে যাওয়া এই তিনজন সাহাবী ছিলেন- হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.), হযরত মুরারা বিন রবী' (রা.) এবং হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.)। আর তারা তিনজনই আনসারী সাহাবী ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে হযরত মুরার (রা.)'র পৃথক কোন বর্ণনা নেই। হযরত কা'ব বিন মালেক-এরই বিস্তারিত বর্ণনা

রয়েছে যা হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.) সম্পর্কে গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি। তাই পুনরায় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হলো হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্ এবং আবু গাযওয়ান। হযরত উতবা বনু নওফেল বিন আবদে মানাফ গোত্রের মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল গাযওয়ান বিন জাবের। হযরত উতবার ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্ ছাড়া আবু গাযওয়ানও বলা হয়ে থাকে- যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত উতবা আরদা বিনতে হারেসকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আমি সেসব লোকের মাঝে সপ্তম ছিলাম যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দিয়েছিল। ইবনে আসীর-এর মতে হযরত উতবা যখন ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অপরদিকে ইবনে সা'দ এর মতে মদিনায় হিজরতের সময় তিনি চল্লিশ বছর বয়স্ক ছিলেন। যাহোক, তিনি যখন ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন, তখন মহানবী (সা.) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। হযরত উতবা মহানবী (সা.)-এর সাথেই অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তারা উভয়ে প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ উভয়ের মদিনায় হিজরতের ঘটনার বর্ণনা হলো- মক্কা থেকে তারা উভয়ে মুশরেক কুরাইশদের সেনাদলের সাথে বের হন যেন মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে পারেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি সেনাদল 'সানিয়্যাতুল মারআ' অভিমুখে প্রেরণ করেন। এটি রাবেখ শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আর মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। [মহানবী (সা.) এদিকে একটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন।] কুরাইশদের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইকরামা বিন আবু জাহল। এই উভয় দলের মাঝে একটি তির নিক্ষেপ ছাড়া কোন লড়াই হয় নি, যা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস নিক্ষেপ করেছিলেন, আর খোদার পথে নিক্ষিপ্ত প্রথম তির ছিল সেটি। সেদিন হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত মিক্বদাদ পালিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দেন। তারা সেই কাফেলায় কাফেরদের সাথে এসেছিলেন, কিন্তু যেমনটি ইতিপূর্বে হযরত মিক্বদাদ-এর স্মৃতিচারণে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অপর দিকে চলে আসেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে তরবারির জিহাদের সূচনা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের উল্লেখ করতে গিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে বর্ণনা করেন যে,

তরবারির জিহাদের অনুমতি সম্পর্কে প্রথম কুরআনী আয়াত দ্বিতীয় হিজরী সনে সফর মাসের ১২ তারিখে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ-ঘোষণার যে ঐশী ইঙ্গিত হিজরতের মাঝে করা হয়েছিল, তার যথারীতি ঘোষণা দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে করা হয়, যখন কিনা মহানবী (সা.) মদিনার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। আর এভাবে জিহাদের সূচনা হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কাফিরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য মহানবী (সা.) প্রাথমিকভাবে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা তার উন্নত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং রণকৌশলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং খুবই সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর সেসব পদক্ষেপ ছিল-

প্রথমত তিনি (সা.) স্বয়ং সফর করে চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করতে আরম্ভ করেন যেন মদিনার আশপাশের এলাকা বিপদমুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষত সেসব গোত্রকে দৃষ্টিপটে রাখেন যারা কুরাইশদের সিরিয়ায় যাতায়াত পথের সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করত, কেননা যেমনটি সবাই অনুধাবন করতে পারে যে, এরা-ই সেসব গোত্র ছিল যাদের কাছ থেকে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের বিপক্ষে বেশি সাহায্য লাভ করতে পারত এবং যাদের শত্রুতা মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারত।

দ্বিতীয়ত তিনি (সা.) যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি খবর সংগ্রহকারী ছোট ছোট দল মদিনার বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন যেন কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আর কুরাইশদেরও যেন এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে থাকে যে, মুসলমানরা অসতর্ক নয়। আর এভাবে মদিনা অতর্কিত আক্রমণের সংকট থেকে মুক্ত থাকবে।

মদিনায় পৌঁছার পর মহানবী (সা.) তৃতীয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, এসব দল প্রেরণের পেছনে তার একটি উদ্দেশ্য এটিও ছিল যে, এর মাধ্যমে মক্কা এবং এর আশপাশের দুর্বল এবং দরিদ্র মুসলমানদের যেন মদিনার মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়ার সুযোগ ঘটে। কেননা তখনও মক্কার আশপাশের অঞ্চলে এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা আন্তরিকভাবে মুসলমান ছিলেন কিন্তু কুরাইশদের অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করতে পারছিলেন না আর নিজেদের দারিদ্র্য এবং দুর্বলতার কারণে হিজরত করার সামর্থ্যও তাদের ছিল না, কেননা কুরাইশরা এমন লোকদের হিজরত করতে জোরপূর্বক বাঁধা দিত। অতএব পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

অর্থাৎ হে মু'মিনরা! খোদার ধর্মের সুরক্ষার্থে যুদ্ধ না করার তোমাদের কোন কারণ নেই। আর সেসব পুরুষ, নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এবং দোয়া করছে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই শহর থেকে মুক্তি দাও যার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর আমাদের মতো দুর্বলদের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী প্রেরণ কর। **(সূরা আন্ নিসা: ৭৬)**

অতএব এসব দল প্রেরণের পেছনে এটিও একটি উদ্দেশ্য ছিল, যেন এমন লোকেরা অত্যাচারী জাতির কাছ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ পায়। অর্থাৎ এমন লোকেরা যেন কুরাইশদের কাফেলার সঙ্গী হয়ে মদিনার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবং এরপর পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগদান করতে পারে। অতএব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন-

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, প্রথম যে দলটিকে মহানবী (সা.) উবায়দা বিন আল্ হারেস-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেছিলেন এবং যেটি ইকরামা বিন আবু জাহল-এর একটি দলের মুখোমুখি হয়েছিল, সেখানে মক্কার দু'জন দুর্বল মুসলমান, যারা কুরাইশদের সাথে এসেছিল, কুরাইশদের পরিত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয়। অতএব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এই অভিযানে মুসলমানদের বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হলে দু'ব্যক্তি- মিক্বদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.), যারা বনু যোহরা এবং বনু নওফেল-

এর মিত্র ছিলেন, মুশরিকদের কাছ থেকে পালিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগদান করেন। তারা উভয়ে মুসলমান ছিলেন এবং কেবলমাত্র কাফিরদের আড়াল নিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যই বের হয়েছিলেন। অতএব এসব দল প্রেরণের পেছনে মহানবী (সা.)-এর একটি উদ্দেশ্য এটিও ছিল যেন এমন লোকেদের অত্যাচারী কুরাইশদের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ হতে থাকে।

তিনি (সা.) চতুর্থ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি কুরাইশদের সেসব ব্যবসায়িক কফেলাকে বাধা দেয়া আরম্ভ করেন, যারা মক্কা থেকে সিরিয়ায় আসা যাওয়ার পথে মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। কেননা প্রথমত এসব কাফেলা যে দিক দিয়েই যেত, মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে থাকত আর জানা কথা যে, মদিনার আশপাশে ইসলামের শত্রুতার বীজ বপিত হওয়া মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল।

দ্বিতীয়ত এসব কাফেলা সর্বদা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত থাকত। আর সবাই অনুধাবন করতে পারে যে, এ ধরনের কাফেলার মদিনার এত নিকট দিয়ে যাওয়া মোটেই আশঙ্কামুক্ত ছিল না। আর তৃতীয়ত কুরাইশরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করত। এরূপ পরিস্থিতিতে কুরাইশদের দুর্বল করা ও তাদেরকে তাদের অত্যাচারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা এবং সন্ধি করতে বাধ্য করার জন্য সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত এবং কার্যকর মাধ্যম ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেয়া। অতএব ইতিহাস সাক্ষী যে, কুরাইশরা যেসব কারণে অবশেষে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে তার মাঝে অনেক বড় একটি কারণ ছিল তাদের বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ হওয়া বা বন্ধ হওয়া। অতএব এটি অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল, যা যথাসময় কার্যকরী ফল বয়ে এনেছে।

এছাড়া আরেকটি কারণ হলো, কুরাইশদের এসব কাফেলার লভ্যাংশের অর্থ অধিকাংশ সময় ইসলামকে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় ব্যয় করা হতো। বরং কোন কোন কাফেলা বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হতো যে, তাদের লভ্যাংশের পুরো অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সবাই বুঝতে পারবে যে, এসব কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করা নিজ সত্তায়ও কতটা যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য ছিল।

উবায়দা বিন হারেস (রা.)'র অভিযান, যাতে হযরত উতবা কুরাইশদের বাহিনী ছেড়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগদান করেছিলেন, এর বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা এরূপ, (এর কিছু অংশ বিগত কোন খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি। তথাপি এখানেও কিছুটা বলে দিচ্ছি,) দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে তিনি (সা.) তাঁর একজন নিকটাত্মীয় উবায়দা বিন হারেস মুত্তালবী (রা.)'র নেতৃত্বে ষাটজন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরদের একটি দল প্রেরণ করেন। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করা। এটি সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকেরই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অতঃপর উবায়দা বিন আল্ হারেস (রা.) এবং তার সঙ্গীরা কিছুদূর পথ পাড়ি দিয়ে সানীয়্যাতুল মারআ-এর কাছাকাছি পৌঁছলে হঠাৎ তারা দেখতে পান, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত কুরাইশদের দু'শ যুবক ইকরামা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বে শিবির স্থাপন করে আছে। উভয় পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে কিছুটা তির ছোড়াছুঁড়িও হয়। কিন্তু এরপর মুসলমানদের পেছনে অতিরিক্ত বাহিনী আছে ভেবে ভয়ে মুশরিকদের দল যুদ্ধ করা থেকে পিছপা হয়ে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে নি। যদিও মুশরিকদের সেনাদল থেকে দু'জন- মিকদাদ বিন আমর

এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) ইকরামা বিন আবু জাহলের সেনাদল থেকে নিজেরাই পালিয়ে মুসলমানদের দলে এসে যোগদান করেন। আর লিখিত আছে যে, সুযোগ বুঝে মুসলমানদের দলে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যেই তারা কুরাইশদের সাথে বেরিয়েছিলেন। তারা মনে মনে মুসলমান ছিলেন কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে আর কুরাইশদের ভয়ে হিজরত করতে পারছিলেন না। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিশ্লেষণ করেন যে, সম্ভবত এই ঘটনা-ই কুরাইশদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল এবং তারা এটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে পিছপা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসে এর উল্লেখ নেই যে, কুরাইশদের এই বাহিনী, যেটি নির্ঘাত কোন বাণিজ্যিক কাফেলা ছিল না এবং যেটি সম্পর্কে ইবনে ইসহাক জাম্‌য়ে আযীম অর্থাৎ বিশাল সেনাবাহিনী শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিল কিনা। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত যে, তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। আর এটি আল্লাহ্ তা'লারই কৃপা ছিল যে, মুসলমানদের চৌকস ও সতর্ক দেখতে পেয়ে এবং নিজেদের কতককে মুসলমানদের দলে ভিড়তে দেখে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং ফিরে যায়। আর এই অভিযানের ফলে সাহাবীদের তাৎক্ষণিক যে লাভ হয় তা হলো, কুরাইশদের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে দু'টি মুসলমান আত্মা মুক্তি লাভ করে।

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) এবং তার মুক্ত কৃতদাস খাব্বাব (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে হিজরত করেন, তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে যে, তখন কুবায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালমা আজলানী (রা.)'র গৃহে অবস্থান করেন এবং হযরত উতবা যখন মদিনা পৌঁছেন তখন তিনি হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)'র গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত আবু দাজানা'র মাঝে ভাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) সম্পর্কে আরো কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে উপস্থাপন করব।

এখন আমি প্রথমত এই ঘোষণা করতে চাই যে, দৈনিক আল্ ফযল-এর ওয়েব সাইট আরম্ভ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করব। অনুরূপভাবে দু'টি জানাযাও রয়েছে, সেই মরহুমদেরও স্মৃতিচারণ করব।

দৈনিক আল্ ফযল এর ১০৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লন্ডন থেকে দৈনিক আল্ ফযল অনলাইন সংস্করণের সূচনা হচ্ছে। আর এই দৈনিক পত্রিকা আল্ ফযল আজ থেকে ১০৬ বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অনুমতি ও দোয়ার মাধ্যমে ১৮ই জুন ১৯১৩ সনে প্রকাশ করা আরম্ভ করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিছুদিন এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে, এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নেতৃত্বে এটি রাবওয়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রাচীনতম উর্দূ দৈনিক পত্রিকা আল্ ফযল এর অনলাইন সংস্করণ লন্ডন থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে আরম্ভ হচ্ছে। আজ ইনশাআল্লাহ্ এর উদ্বোধন হবে যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র অতি সহজেই পাওয়া যাবে। এর ওয়েব সাইট alfazlonline.org প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং প্রথম সংখ্যাও এতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় যে আই.টি টিম রয়েছে তারা এর জন্য অনেক কাজ করেছে। এর মাঝে আল্ ফযলের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি সম্পর্কিত অনেক কিছুই রয়েছে। 'মহান আল্লাহ্‌র বাণী' বিষয়বস্তুর অধীনে পবিত্র কুরআনের আয়াতও দেয়া হবে আর মহানবী (সা.)-এর বাণীর অধীনে হাদীসও থাকবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অমৃতবাণী সম্বলিত উদ্ধৃতিও থাকবে। অনুরূপভাবে কতক আহমদী প্রবন্ধকারের

প্রবন্ধ এবং অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, সেগুলোও এখানে থাকবে। আহমদী কবিদের কবিতাও এখানে থাকবে। এই পত্রিকা ওয়েব সাইট ছাড়া টুইটারেও রয়েছে আর এর এন্ড্রয়েড এ্যাপও তৈরি হয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সকল ক্ষেত্রে এখন যেহেতু এর দৈনিক সংস্করণ সহজলভ্য তাই যারা উর্দূ পড়তে পারেন তাদের এটি থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে প্রবন্ধকার এবং কবিগণও নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে এটিকে সহায়তা করুন যেন উৎকৃষ্ট এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ এতে প্রকাশ করা যায়। এই ওয়েব সাইটে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা পিডিএফ আকারে ইমেজ ফাইলও থাকবে যা সরাসরি পাঠ করার পাশাপাশি ডাউনলোডও করা যাবে অথবা যারা প্রিন্ট করে পড়তে চায় তারাও পড়তে পারবে। মোটকথা আজ এটির উদ্বোধন হবে ইনশাআল্লাহ্। অনুরূপভাবে প্রতি সোমবার এই ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ জুমুআর খুতবা প্রকাশ করা হবে এবং চলতি সপ্তাহের খুতবার সারাংশও দেয়া হবে। ইনশাআল্লাহ্ জুমু'আর পর এটির উদ্বোধন হবে।

আজ আমি দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব ইনশাআল্লাহ্। তাদের মাঝে প্রথমজন হলেন, শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা তানভীরুল ইসলাম সাহেবার জানাযা, যিনি মরহুম মুকাররম মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের সহধর্মীনি ছিলেন। গত ৭ই ডিসেম্বর ৯১ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো- তার পিতার নাম ছিল মীর আব্দুস্ সালাম। তিনি (মরহুমা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরনো নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রা.)'র প্রপৌত্রি ছিলেন, হযরত সৈয়্যদ মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের পৌত্রি ছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধু ছিলেন। হযরত মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রা.) একজন বিখ্যাত সাহাবীও বটে। তিনি ১৮৩৯ সালে শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে খুবই সুপরিচিত হেকিম ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোটে অবস্থান করছিলেন তখন হেকীম সাহেব ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র দিতেন। সে যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার গৃহের একটি অংশে বসবাসও করেছেন আর ১৮৭৭ সালে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোটে আসেন তখন হেকীম সাহেবের গৃহে একটি নিমন্ত্রনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই যুবক বয়সের আদর্শ এরূপ পূতঃপবিত্র ছিল যে, যখন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেন তখন যারা পবিত্রচেতা এবং পুণ্য প্রকৃতির ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচক্ষণতার নূর থেকে অংশ লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা তাঁকে (আ.) গ্রহণ করেন আর শিয়ালকোটের যে বন্ধুরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এই পরিবারটিও সর্বাগ্রে ছিল। ১৮৯০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। বয়আতের রেজিস্টার অনুযায়ী তার নম্বর হলো, ২১৩ এবং তাঁর স্ত্রী ফিরোজা বেগম সাহেবার নম্বর ২৪৬, যিনি ১৮৯২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বয়আত করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় পুস্তকে তার নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন ইযালায়ে আওহাম, আসমানী ফয়সালা, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, তোহফায়ে কায়সারিয়া, সিরাজুম মুনীর, কিতাবুল বারিয়্যা, হকীকাতুল ওহী এবং মলফুযাতের পঞ্চম খণ্ডের অনেক জায়গায় তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী, জলসায় অংশগ্রহণকারী, হীরক জয়ন্তী জলসার চাঁদাদাতা এবং শান্তিপূর্ণ জামা'তের সদস্য হিসেবে তার নাম উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা তানভীরুল ইসলাম সাহেবা তারই বংশধর ছিলেন এবং তিনি ১৯২৮ সালে শিয়ালকোটে জন্মলাভ করেন আর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। আর এভাবে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধু হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৪৮ বছর তিনি কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রদর্শনী সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একইভাবে তার আরো অনেক সেবা রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র সাথে তার খুবই স্নেহসুলভ সম্পর্ক ছিল। তাহাজ্জুদ পড়ার বিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। বরং তার গৃহকর্মী বলেছে, যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতেও তিনি ৩টার দিকে তাহাজ্জুদ নামায পড়েন এবং এরপর ঘুমিয়ে পড়েন আর এ অবস্থায়-ই তার মৃত্যু হয়। তার কন্যা বলেন, আমাকে তিনি বলতেন, বিয়ের পর আমি যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধু হয়ে এই পরিবারে আসি তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং হযরত উম্মে নাসের আমাকে এমন আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন যে, আমি পিত্রালয়ের কথা একেবারেই ভুলে যাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র অনেক কথাই তার স্মরণে ছিল আর তার স্মরণশক্তি প্রখর ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন, দয়া করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে আমেরিকা নিবাসী আমাদের মরহুমা সিস্টার হাজাহ্ শাকুরা নূরিয়া সাহেবার, যিনি ১লা ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯২৭ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াশিংটন ডিসি'তে তার প্রাথমিক জীবন কাটে। ১৯৬০ এর দশকে তিনি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীত তিনি ওয়ার্ল্ড হিস্টোরী বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। অবসর গ্রহণের পর তার প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী হওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত ঈসা (আ.) খোদার পুত্র নন তখন তিনি অন্য পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর এরপর ১৯৬৮ সনে তিনি যথারীতি চার্চে যাওয়াও বন্ধ করে দেন। আমেরিকা, ম্যাক্সিকো এবং কানাডায় সফর করার পর তিনি আফ্রিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য এক বছরের ছুটি নেন। এরপর তিনি ইউরোপও সফর করেন। মনের মাঝে জাগ্রত হওয়া ধর্মীয় বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যাদির সমাধানের সন্ধানে থাকতেন। ওয়াশিংটন ডিসি'তে ফিরে আসার পর তিনি ইসলামের সাথে পরিচিত হন। বিমানবন্দরে তার এক বন্ধুর ছেলের সাথে আকস্মিকভাবে তার সাক্ষাত হয় যিনি কিছু দিন পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় সেখানে শ্রদ্ধেয় মীর মুহাম্মদ আহমদ নাসের সাহেব অবস্থান করছিলেন। তার সাথে (অর্থাৎ, সেই নবাগত আহমদীর সাথে) সাক্ষাতের জন্য মুবাশ্বের সাহেবের সাথে শ্রদ্ধেয় মীর মুহাম্মদ আহমদ নাসের সাহেবও বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই তখন তার সাথেও পরিচয় হয়। তারা তাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবগত করেন। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং ধীরে ধীরে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন আর তিনি যে বিশ্বাসের সন্ধানে ছিলেন তা তিনি ইসলামের মাঝে দেখতে পান। ১৯৭৯ সনে স্বপ্নে তিনি একটি পবিত্র কুরআন ও কলেমা শাহাদাত দেখতে পান। এরপর তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীয়াত তথা ইসলামই সত্যিকার ধর্ম। তাই তিনি বয়আত করেন। বয়আত করার পর তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামা'তের সেবা করেছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ আমেরিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি শুধু অংশগ্রহণই করতেন না বরং সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। ১৯৮৬ সনে তিনি ওয়াশিংটন

ডিসি মজলিসের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন, এখানে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং একইভাবে তিনি ন্যাশনাল নায়েব সদর হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিভাগে সেবা করার সুযোগ পান। ১৯৯৫ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র নির্দেশনা ও পথনির্দেশ অনুসারে পবিত্র কুরআনের পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট যে তফসীর রয়েছে 'ফাইভ ভলিউম কমেন্টারী', এর জন্য ১১৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট সূচীপত্র প্রনয়ণকারী টিমে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লাজনা ইমাইল্লাহ, জামা'ত এবং মজলিসের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৯৭-১৯৯৮ সনে আতফালদের জন্য প্রত্যেক রবিবার ধর্ম-শিক্ষার ক্লাস চালু করেন। নাসেরাতের জন্য আহমদী সামার ক্যাম্প বা গ্রীষ্মকালীন শিবিরে কাউন্সিলর হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি আহমদীয়া ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট্স কমিটিতেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের ওপর যে যুলুম ও নির্যাতন হচ্ছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ডকুমেন্ট প্রস্তুত করেন।

সেখানকার মুবাল্লিগ মুকার্‌রম শামশাদ নাসের সাহেব লিখেন, কিন্তু এসব কাজের চেয়েও বড় যে বিষয়টি তিনি বলতেন তা হলো, তবলীগ করা হলো তার প্রথম পছন্দের কাজ আর সব সময় তবলীগ করাকেই প্রাধান্য দিতেন। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। রেডিও এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি তবলীগ করতেন। নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং বিভিন্ন গীর্জায় গিয়েও তবলীগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। জামা'তের সাহিত্য এবং বই-পুস্তক বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার জন্যও তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিতেন। এটি শামশাদ সাহেবের রিপোর্ট ছিল না বরং অন্য একটি সূত্র থেকে এসেছে। শামশাদ সাহেব যা লিখেছেন তা হলো,

বোন শাকুরা নূরিয়া সাহেবা পর্দার বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি সর্বদা পাকিস্তানী রীতির বোরকা পরিধান করতেন আর কোন কাজের ক্ষেত্রে তার বোরকা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। জামা'তী কাজের জন্য বিভিন্ন সময় তাকে সরকারী সিনেটর, কংগ্রেসম্যান প্রমুখ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হতো আর সেখানেও তিনি বোরকা পরিধান করেই যেতেন আর সব কাজ সুন্দরভাবে সমাধা করতেন। তবলীগের কাজে মুবাল্লিগদেরকে অনেক সহযোগিতা করতেন। শামশাদ সাহেব বলেন, আমি যখন এখানে নতুন আসি তখন আমার সাথে বসে আমাকে আমেরিকার ইতিহাস অবগত করেন আর কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেন। তিনি আরো লিখেন, খিলাফতের প্রতি তার অসাধারণ সম্মান ছিল এবং ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল। গত বছর ২০১৮ সনে আমি যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম, তখন অসুস্থতা সত্ত্বেও হুইল চেয়ারে বসে অনেক কষ্ট করে সাক্ষাতের জন্য আসেন। খুতবা নিয়মিত শুনতেন। শুরুতে যখন এমটিএ ছিল না আর ক্যাসেটের মাধ্যমে খুতবা পাওয়া যেত তখন খুতবার ইংরেজী অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অনেক সহায়তা করতেন। পাঁচবেলার নামায বাজামা'ত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি লিখেন, আমি যখনই তাকে দেখেছি, তখন মসজিদেই দেখেছি আর মসজিদে নিয়মিত বাজামা'ত নামাযে অংশ নিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং আন্তরিক এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লা জামা'তে আরো অধিক দান করুন। (আমীন)